Prajñābāridhi : Journal of Multidisciplinary Research

Journal Homepage - https://www.collegetsm.in/college-journal/

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও বিশ্বতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা

সুস্মিতা মণ্ডল

দর্শন বিভাগ (SACT-II)

তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়

দুরভাস -৮৭৬৮২৯২৩৫৬, ইমেইল :-susmitamondal8089@gmail.com

সারাংশ : প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে অতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত দার্শনিকরা ও বিজ্ঞানীরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন সেটি হল – জগৎ আসলে কী ? এর উপাদানগুলি কি কি ? এবং এর উৎপত্তির ইতিহাস গাথা। এই বিষয়ে সকলেই যে একমত হতে পেরেছেন তাও কিন্তু নয়। আবার যে সকলেই নিজেদের মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছেন তাও কিন্তু নয়। আসল কথা হল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এবং পাশ্চাত্য দর্শন সম্প্রদায়ের এই বিষয়ে পৃথক মন্তব্য করেছেন আমি এই এককে কেবলমাত্র আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে কী কী বলতে চেয়েছেন এবং এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিকতা কতদূর প্রসারিত – সেই বিষয়ে একটি আলোচনা করছি মাত্র যাতে সকল পাঠক এই তত্ত্বের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্যগুলি জানতে পারেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে চাইছি।

Keyword: ‘জগৎ’, ‘সৃষ্টি’, ‘জড়জগৎ’, ‘চৈতন্যজগৎ’, ‘বস্তুস্থিতি’ এবং ‘কার্যকারণ’ সম্বন্ধ।

ভূমিকা : সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বছর ধরে প্রচণ্ড চাপ, তাপ, রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে জীব বা প্রাণীকূল এবং উদ্ভিদকূল। এই জগৎ সৃষ্টি কীভাবে হল ? – এই প্রশ্নের উত্তরে দুই দার্শনিক সম্প্রদায় যথা – প্রাচ্য বা ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এবং পাশ্চাত্য দর্শন সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ পোষণ করেন এবং এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সংমিশ্রণে এক নব প্রজন্মের উদ্ভব হয়।

অনুসন্ধানের বিষয় : আমার এই প্রবন্ধে অনুসন্ধানের বিষয় হল – সমগ্র আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

মূল বিষয় : জগৎ বা 'সৃষ্টি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কী ? উত্তরে ভারতীয় দর্শনে বলা হয় জগৎ হল এক কঠোর-কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন। আবার আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বলা হয়েছে জগৎ হল এক পরিকাঠামোগত দিক। যা আবার ভাষাকেও বর্ণনা করে থাকে।

আমরা এখন দেখব আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে জগতের ব্যাখ্যা ঠিক কী রূপ তার একটি বিবরণ সারণী। তা বর্ণিত হল –

জগৎ সৃষ্টির মূল উপাদান : এই গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উপাদান কী ? সেই বিষয়ে আধুনিক মত খুবই আকর্ষণীয় ও মনোযোগী। প্রাচীন মতবাদগুলি আমার এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। আমি এখানে সকল পাঠক-পাঠিকাদের আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত ঠিক কী – সেই বিষয়েই আলোকপাত করব।

প্রকৃতি বা জগৎ বা সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে আধুনিক দার্শনিকগণের মতামত : প্রাচীন যুগের পরবর্তী যুগ এবং ডেকার্টের যুগের পূর্ববর্তী যুগকে পাশ্চাত্য দর্শনে মধ্যযুগ বলা হয়। এই সময়ে এই সৃষ্টিতত্ত্বের কোনো আলোচনাই সুবিস্তৃত হয়নি। তবে সেন্ট অগাস্টিনের দর্শনে এই বিষয়ে অল্পবিস্তর প্রভাব দেখা যায়।

মূলত এই মধ্যযুগটিকে অন্ধকারময় যুগ বলা হয়, কিন্তু কালক্রমে এই অবস্থান পরিবর্তন ঘটল এবং ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চিন্তাজগতে যে নবজাগরণ আরম্ভ হয় তার প্রভাব দর্শন চিন্তার উপরেও পড়ে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্ভব হয়। এখন আমি এই পর্যায়ের দার্শনিকদের মতামতগুলির আলোচনা করছি।

ডেকার্ট (Decartes) (Modern Theories): ডেকার্ট ১৫৯৬ সালে ফ্রান্সের তুরীন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোক গমন করেন ১৬৫০ খ্রীঃ। ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চিন্তাজগতে যে নবজাগরণ আরম্ভ হয় তার প্রভাব দর্শন-চিন্তার উপরেও পড়ে। তৎকালীন যেসব দার্শনিকদের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে ফরাসি দার্শনিক বেঁনে ডেকার্টের স্থান সর্বোচ্চ। ডেকার্তে যে কেবলমাত্র নতুন চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও এই চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আধুনিক জগতে ডেকার্তেই সর্বপ্রথম ঈশ্বর, মানবাত্মা, জগতের চরম সত্ত্বা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দার্শনিক চিন্তা করবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং সেই অনুভূতি অনুসারে তাঁর পর্বেকার সমস্ত মতবাদকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এক নতুন দর্শন রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত ভাবে তাঁর অভিমতকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজে বিনা বিচারে সকল রকম বিশ্বাস ও মতবাদকে

উপেক্ষা করে কিভাবে স্বাধীন চিন্তার ভিত্তিতে দর্শন রচনা করা উচিত তার পথ দেখিয়েছিলেন। জাগতিক তত্ত্বানুসন্ধানে একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রস্থান-বিন্দু থেকে যাত্রা করতে হবে এবং সেই প্রস্থান বিন্দু এমন একটি বচন হবে যার সত্যতা দার্শনিকের নিজের অনুভূতিলব্ধ বা বিচারবুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হবে – ডেকার্তের এই মতবাদ তাঁর পরবর্তী দার্শনিকদের সকলের উপরেই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

দার্শনিক ডেকার্টই প্রথমে জগৎকে জ্ঞাতা বা বিষয়ীর জ্ঞানের বিষয় বলে বিবেচনা করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর দর্শনে আত্মজ্ঞান, জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয় জগতের সম্বন্ধ, জ্ঞানের প্রকৃতি, সত্যতার নির্ণায়ক প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এক একটি বিশেষ বিভাগ গড়ে উঠেছিল তার নাম হল জ্ঞানতত্ত্ব। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্যই অনেকে তাকে আধুনিক দর্শনের জনক বলে থাকেন।

ডেকার্টের মতে, এ বিশ্ব জগতের মূলে মাত্র দুটি সত্তা আছে। যথা – জড় (matter) এবং মন (soul or mind) জড় হল মনের পুরো বিপরীত। একটিকে অপর একটিতে রূপান্তরিত করা যায় না। ঠিক যেমন ভারতীয় দর্শনের সাংখ্য সম্প্রদায় প্রকৃতি এবং পুরুষ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদে দুই প্রকার তত্ত্ব স্বীকার করে এবং এবারও একে অপরের থেকে বিপরীত ধর্মযুক্ত। জড়ের ধর্ম হল বিস্তার মনের ধর্ম চিন্তন। এই জড় যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আর মন উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং জড় নিষ্ক্রিয়, মন সক্রিয় – এই তত্ত্ব দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত।

দেকার্তের মতে, চৈতন্যময় আত্মা সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ এবং ঐ আত্মা বাহ্য পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই জড় ও চেতন আবার উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে তারা ঈশ্বর সাপেক্ষ। কিন্তু তাঁর মতে ঈশ্বর যেহেতু চৈতন্যময় আত্মা, সেহেতু তিনি জড় ও চেতন দুই প্রকার পদার্থই স্বীকার করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি – 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি' (I think, therefore I am) এই সুনিশ্চিত সত্যের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করেছেন অপর এক অস্তিত্ব সূচক বচন সেটি হল 'জড়জগৎ আছে'। ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠার উল্লেখ করে ডেকার্ট মন অতিরিক্ত বাহ্যজগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

এই বাহ্যজগৎ বা জড়জগতে অবস্থান করে অসংখ্য জড়বস্তু। যেমন – পাহাড়, পর্বত, নদী, গাছপালা, ইত্যাদি। আর চেতন জগৎ-এ আছে অসংখ্য অহং – আমি, তুমি ইত্যাদি। এগুলিকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করি না। গুণগুলিকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকি। আমরা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে জানতে পারি। দ্বিতীয় মেডিটেশনে তিনি মোমখণ্ডের দৃষ্টান্তের সাহায্যে বর্হিজগৎ এবং জাগতিক বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিপাত করেছি। দৃষ্টান্তটি এরকম– সদ্য মৌচাক থেকে আনা একটি মোমখণ্ড যার মধ্যে একটি বিশেষ রঙ আছে, ফুলের সুগন্ধ থাকে, মিষ্টত্ব থাকে। মোমটিতে আঙুলের টোকা দিলে মৃদ্যুশব্দ হয়। এবার এ মোমটিকে আগুনের পাশে রাখলে তা তরল পদার্থে পরিণত হয় যাতে আগের রঙ, গন্ধ স্বাদ কিছুই থাকে না এবং শব্দ হয় না। তবে পদার্থটির গুণের পরিবর্তন হলেও মোমটির কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যাছে যে অবশ্যই একটি অনিবার্য ধর্ম আছে, যা সকল জড়বস্তুর মধ্যে সমান ভাবে বর্তমান। আসলে ঈশ্বরই হলেন এই জড়বস্তুর মধ্যে গতির মূল সঞ্চালক। তিনি জড়বস্তুর মধ্যে গতির সঞ্চার ঘটিয়ে এই সমগ্র বিশ্বকে এক বিশাল যন্ত্রে পরিণত করেছে।

ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠার উপর নির্ভর করে তাই এমন কথা বলতে হয় যে, সৃষ্টিরলগ্নে ঈশ্বর আদের যে বুদ্ধির আলোক প্রদান করেছেন তা নিখাদ এবং সেই বুদ্ধি স্বচ্ছ আলোকে আমরা যে জগৎ স্পষ্ট বিবিক্তরূপে প্রত্যক্ষ করি তা অলীক বা মিথ্যা নয়, সত্য জগৎ।

স্পিনোজা (Benedict Spenoza): ১৬৩২ খ্রীঃ বেনেডিক্ট স্পিনোজা জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোকগমন করেন ১৬৭৭ খ্রীঃ। দর্শনের ইতিহাসে স্পিনোজা একজন বুদ্ধিবাদ অদ্বৈতবাদী। তিনি দ্রব্য (substance), ঈশ্বর (God) প্রকৃতি (Nature) এই তিন সত্তাকে একে অপরের পরিপূরক বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে তার বিখ্যাত সমীকরণটি হল – দ্রব্য = ঈশ্বর = প্রকৃতি। অর্থাৎ তত্ত্বগত দিক থেকে যা ঈশ্বর, অভিজ্ঞতার দিক থেকে তাই জগৎ। কোনো জগতের সব কিছুর মধ্যে যা সাধারণভাবে বিদ্যমান তা হল এক তাদ্বয় ঈশ্বর।

ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী নয়, ঈশ্বর হল জগতের অন্তঃস্যূত। তাই ঈশ্বরই জগৎ, জগৎই ঈশ্বর। এখানে প্রকৃতি বলতে বা জগৎ বলতে সমগ্রতাকে বোঝায়। তাই জগৎ বলতে সমগ্রতাকে বোঝায়। তাই জগৎ সৃষ্টি হয়নি। অনাদিকাল ধরে ঈশ্বর যেমন আছেন, জগৎও ঠিক একই রকম ভাবে আছে। একে বলে সৃজন প্রকৃতি (Natura naturata)। স্পিনোজার মতে এক ঈশ্বর হলেন পরমতত্ত্ব আর চৈতন্য ও জড় নির্গুণ ঈশ্বরে মনুষ্যবুদ্ধির দ্বারা আরোপিত ধর্ম এবং ঐ ধর্মটি জড় ও চেতন বা মানব বস্তুরূপে আকারিত হয়ে থাকে। জগৎ হল একই পরমদ্রব্যের প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানুষের মন বা আত্মাকে কারণ-কার্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ ধারণার সমষ্টিমাত্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠিক যেন ভারতীয় আস্তিক দর্শন অদ্বৈত দর্শনেরই প্রতিচ্ছবি। শঙ্করাচার্য বলেছেন সেই পরম এক অদ্বয়, নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই হলেন সর্বভেদ বর্জিত এক সত্তা। যেখানে ব্যবহারিক ভেদময় জগৎ ও জগতের বস্তুসকল একই পরম দ্রব্যে বিলীন হয়ে গিয়ে এ প্রপঞ্চময় জগতের সৃষ্টি করে এবং সমগ্র বিশ্বের ঐক্যকে এক সুসংবদ্ধ, বৈচিত্রময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে।

কোপলস্টোন বলেছিলেন স্পিনোজার সসীম বিকারবিশিষ্ট জগৎ বা প্রকৃতি বা সৃষ্ট প্রকৃতি এবং অসীম প্রকৃতি বা সৃজনী প্রকৃতি এখানে ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রকৃতি কথাটি প্রতিস্থাপন করলে তাঁর বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাবে সকলকে বোঝানো যাবে বলে মনে করেন।

আসলে ‘প্রকৃতি’ হল একটি অসীম তন্ত্র যার মধরে বিশেষ কারণসমূহের একটি শৃঙ্খল আছে যেহেতু এই অসীম প্রকৃতি আছে তাই কারণশৃঙ্খলটি বজায় থাকে। সুতরাং একই অসীম তন্ত্রকে দুটি ভিন্ন দিক থেকে কখনও সৃষ্ট প্রকৃতি আর কখনও বা সৃষ্ট প্রকৃতি রূপে উপলব্ধি করি মাত্র। সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতি (জগৎ) = দ্রব্য = ঈশ্বর (দুই নয় অর্থাৎ এক, নির্বিশেষ জগৎই হল দ্রব্য বা ঈশ্বর স্বরূপ)।

গটফ্রিড উইলহেম লাইবনিজ (Gottfried Wilhelm Leibnitz) : জার্মানের লিপজিগ নগরে ১৬৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৭১৬ খ্রীঃ। তিনি একজন বুদ্ধিজীবী, বহুত্ববাদী এবং পরমাণুবাদী ছিলেন। তাঁর বহুত্ববাদের তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি জড় সম্পর্কে এক বিপ্লবাত্মক মতবাদ দিয়েছিলেন তা হল – বিশ্ব হল কতগুলো কণার দ্বারা সৃষ্ট যার নাম চিৎ পরমাণু বা মনাড। এই মনাড কোন জড় বস্তু নয়, বরং এগুলো হলো গতি ও শক্তির কেন্দ্রবিন্দু এগুলি মানসিক এবং পূর্ণ চেতনাযুক্ত ও উন্নত শ্রেণীর।

লাইবনিজ বহুত্ববাদী। তিনি বলেন এই সুশৃঙ্খল সুসংহত জগতের মূলে অসংখ্য চিৎপরমাণু আছে যাদের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং গবাক্ষহীন। কোন মনাড অন্য কোন মনাডকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং নিজে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ও না। জগতের মধ্যে কিছু অনিয়মের অসঙ্গতি নজির থাকলেও তাদের নিয়ে জগৎ হল সম্ভাব্য সকল জগতের মধ্যে সর্বোত্তম জগৎ (best of all possible worlds)। প্রত্যেক মনাড তাদের আত্মা বিকাশের উদ্দেশ্যে একযোগে ক্রিয়া করলেও তাদের মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। তাদের প্রত্যেকে কেবল একে অপররের সঙ্গে একযোগে তা বিবর্তিত হয় এবং এই সহপরিবর্তনের জন্যই জগতের ঐক্যতান রক্ষিত হয় জগৎ এক সুশৃঙ্খল সুসংহত জগতে সম্ভাব্য সকল জগতের মধ্যে থেকে সর্বোত্তম জগতে পরিণত হতে পারে।

প্রতিটি মনাদ তার নিজের জীবন্ত দর্পণে অন্যান্য মনাদ তথা সমগ্র বিশ্বজগৎকে প্রতিফলিত করছে। গতি ও পরিবর্তন মনাদের স্বভাবধর্ম। কাজেই একটি মনাদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মনাডগুলিকেও একইভাবে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। অন্যথায় বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা ও সাম্য অবস্থায় রক্ষিত হবে না। লাইবনিজ তাই অন্য একটি প্রকল্পের সাহায্যে মনাডগুলির আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই নিয়মটির পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ নামে পরিচিত।

ঐ সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর জগতের সঙ্গতি পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। সৃষ্টির প্রথম ক্ষণ থেকেই চিৎপরমাণুযুক্ত বিশ্বসংসার তার অবিরাম ধারায় প্রবাহমান। Coppleston বলেছেন, "According to Leibrothen God pre-established the harmony of the universe in beginning of things, after which everything goes its own way in the phenomena of nature." [A History of Philosophy] প্রতিটি মনাডের সংগতির পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই জড় ও চেতন তথা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গতি সৃষ্টি করেছেন সুনিপুন শিল্পী ঈশ্বর, যাঁর কাজ ত্রুটিমুক্ত। তাই সৃষ্টির শুরুতেই তিনি এঁকে দিয়েছিলেন বিশ্বজগতের ভবিষ্যতের রথচক্র।

ভারতীয় দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিকগণও বহুত্ববাদী এবং এঁনারাও কিছুটা লাইবনিজের মতের মতোই কথা বলেছেন। তবে লাইবনিজের মতে এই জগৎ হল এক নিয়মের জগৎ, শৃঙ্খলাৎ জগৎ, সামঞ্জস্যের জগৎ এবং সর্বোত্তম জগৎ যা ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদের নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কান্ট (Kant): জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট জন্মগ্রহণ করেন ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃতুবরণ করেন ১৮০৪ খ্রীঃ। তিনি বলেন, বুদ্ধিই প্রকৃতি জগতের রচয়িতা (Understanding makes nature)। কান্ট দুটি জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন, যথা – স্বয়ংসদ্বস্তুর জগৎ এবং অবভাসিক জগৎ। স্বয়ংসদ্বস্তুর জগৎ হল এমন জগৎ যেখানে কার্য-কারণ স্বম্বন্ধ বলে কিছু নেই। আর অবভাসিক জগৎ হল এমন জগৎ যেখানে কারণতার ধরণার মাধ্যমে বস্তুজ্ঞান হয়। আসলে দুটি জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলে তাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। কিন্তু কান্ট দুটি জগৎকে স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করেও তাদের সম্বন্ধের উল্লেখ করে বলেছেন বস্তুসত্তা আমাদের জ্ঞানগম্য না হলে তা আমাদের দেহ মনে উত্তেজনা জাগিয়ে সংবেদনের কারণ হয়। এই দুই স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে যোগস্থাপন করেছেন এবং এই সঙ্গে কারণতার ধারণাটিকে সদ্বস্তুর জগতে প্রয়োগ করেছেন।

কান্ট জগতের পরিদৃশ্যমান রূপকে অবভাস বা ফেনোমেনন বলেছেন এবং এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে আসল জগতের স্বরূপটি রয়েছে তাকে নোমেনা (noumana) বলেছেন। আবার এই অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য অবভাসিক জগতের অন্তরালের জগৎকে বলেছেন অতীন্দ্রিয় জগৎ। স্বয়ংসদ্বস্তু দেশ ও কালের আকারে আকারিত হতে পারে না। দেশ ও কালের আকারে আকারিত হলেই তা অনুভব গ্রাহ্য অবভাসিক জগতে পরিমত হয়। জ্ঞানের উপাদান হল ইন্দ্রিয় সংবদেন জন্য অনুভব বা সংবদন। সংবেদনগুলিকে মন সৃষ্টি করতে সঞ্চারিত হয়। জ্ঞানের উপাদানের উৎপাদকরূপে তাই জ্ঞান অতিবর্তী সদ্বুস্তর জগৎকে মানতে হয়।

স্বয়ংসদ্বস্তর জগতে দেশ ও কালের প্রয়োগ না থাকার জন্যই কান্ট বলেন, ইন্দ্রিয়-উদ্দীপনা জনিত সংবদেনের কারণ স্বরূপ সদ্বস্তু থাকলেও তা আমাদের কাছে চিরকালের মতো অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই অপ্রতক্ষীভূত সদ্বস্তুর জগৎকেও কান্ট স্বীকার করেছেন। কাজেই আকার ও প্রকারের জন্য আমরা অবভাসিক জগৎকেই জানতে পারি। কান্ট বলেন, আমাদের বুদ্ধি প্রকৃতিকে অনুসরম করার পরিবর্তে প্রকৃতিই আমাদের বুদ্ধির প্রত্যয়গুলির নিয়মে চলে।

হেগেল (Hegel): জার্মানীয় দার্শনিক জর্জ উইলহেম ফ্রেডরিক হেগেলের জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭০ খ্রীঃ এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৮৩১ খ্রীঃ। তিনি হলেন একজন বিষয়গত ভাববাদী (objective idealist) দার্শনিক। স্পিনোজা এই বৈচিত্র্যময় জগতের কারণকে বিশ্বপ্রকৃতি বলেছেন, ঠিক একই রকমভাবে হেগেল বলেন এই জগতের উৎপত্তি হয়েছে পরমসৎ বস্তু থেকে। তাঁর মতে বিশ্বচেতনাই হল এই পরম সৎ এর মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্বকে হেগেল গাইস্ট (Geist) বলেছেন যার অর্থ সর্বোত্তম ধারণা (the idea) – পরম ধারণা (the obsolute idea)। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বচেতনা থেকেই জড়জগৎ এবং মানুষের মনোজগৎ উৎসারিত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বচেতনা বা পরমাত্মা যুগপৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কেননা এরা একই পরমাত্মার প্রকাশ।

হেগেলের ভাববাদ অনুসারে, বিবর্তন ধারায় পরম সৎ চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশরূপে মানব মন ও জড়জগৎ উভয়েই সত্তাবান স্পিনোজার বৈচিত্র্যময় এই জগতের আদি কারণকে দ্রব্য বা বিশ্বপ্রকৃতি বলেছেন। সদ্বস্তুকে দ্রব্য রূপে গণ্য করা গেলো তাকে স্পিনোজা সম্মতভাবে অপরিণামী বলা যায় না। সদ্বস্তু অপরিণামী হলে সেই সদ্বস্তুকে বলে সমগ্রতা (Totality) বিশ্বপ্রকৃতির সমুদয় বস্তুকে নিয়ে এই সমগ্রতার ক্রম পর্যায় প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং পরমচৈতন্য জড়জগৎ রূপে নিজেকে প্রকটিত করে। কাজেই হেগেলের বিষয়গত ভাববাদে জড়জগৎ মিথ্যা নয়, তা জড়জগৎরূপে নিজেকে প্রতিফলিত করার পর নিজের স্তব্ধভাবকে জানার জন্য, মানুষের চেতনার সদ্বস্তু পরমচৈতন্যের প্রতিফলন ঘটে। হেলেগের এই ব্যাখ্যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভারতীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের ব্রহ্মবাদের কথা। রামানুজ 'ব্রহ্ম'কে চিদাবিদভেদ বিশিষ্ট ঐক্যরূপে কল্পনা করা হয়েছে, ঐ ঐক্যের মধরে ভেদ থাকতে ভেদময়, বিচিত্র জগতকে ব্রহ্মেরই সত্য প্রকাশ বলে সামান্য ও বিশেষ এক ও বস্তুর সম্বন্ধ আন্তর, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ – একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিশ্বের ঐক্য ভেদময় বৈচিত্র্যের মধরে এমনভাবে অনুসৃত হয়ে রয়েছে যে, বৈচিত্র্য যেমন একের উপর নির্ভরশীল, তেমনি অনন্য ব্রহ্মও, তাঁর বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেই অস্তিত্ববান। হেগেল পন্থীরাও এভাবে সবিশেষ ব্রহ্মবাদকে স্বীকার করেছেন। বিশ্বতত্ত্বের জগতের ক্রম বিকাশে উদ্দেশ্য করাণ রূপে এই পরম সৎ তত্ত্বকেই মেনে নিয়েছেন।

ব্রাডলি (Bradley) : ফ্রান্সিস হারবার্ট ব্রাডলি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ভাববাদী দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৬ সালে এবং মৃত্যুবরণ কেরন ১৯২১ এ। ব্রাডলি বলেন যে, পরমব্রহ্ম এমন এক পরম পদার্থ যা ব্যক্তিগত মানবীয়

সত্ত্বা ও মনুষ্যেতর জগতের নৈর্ব্যক্তিক সত্তা উভয়েরই মূল ও উভয়কেই ব্যাখ্যা করো। এই কারণে পরব্রহ্ম কোন ব্যক্তিগত চৈতন্য হতে পারে না – তাকে এক অনন্ত নৈর্ব্যক্তিক চেতনা রূপে কল্পনা করতে হবে।

ব্রাডলির মতে, আমাদের চিন্তা বা বুদ্ধি হল স্বয়ংসৎ পরব্রহ্ম এক সর্বব্যাপী এবং সর্বদা সুসঙ্গত এবং অনুভূতি এই মূলীভূত সৎবিৎ থেকে সম্বন্ধাদিযুক্ত জ্ঞান বা ইচ্ছা অবভাস রূপে নিঃসৃত হয়। অবভামের স্ববিরোধ যদি কোন রকমে দূর করা হয় তাহলে ঐ পরিশোধিত ও পরিমার্জিত অবভাস পরমত্ত্বের অংশ যা সৎ। যার দ্বারা এই জগতে সৃষ্টি হয়েছে।

কিছু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকবৃন্দের মতামত :

1) লকের মত (Locke) : জন লক জন্মগ্রহণ করেন ১৬২৩ খ্রীঃ এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৭০৪ খ্রীঃ। অভিজ্ঞতা বাদের জনক নামে পরিচিত তিনি। তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Concerning Human Understanding গ্রন্থে বলেছেন – ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় সমুদয় জ্ঞানের উৎসমূল এবং তিনি পরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী নামে পরিচিত।

তার মতে, জড় বা বাস্তু উপাদানগুলি কতকগুলি গুণের আধার (substratum)। তিনি বলেন, আমরা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। বরং বস্তুর গুণগুলিকে শুধু প্রত্যক্ষ করতে পারি। লকের সম্পর্কে জানতে হলে বস্তুর গুণ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা অবশ্যই দরকার। বস্তুর দুই প্রকার গুণ আছে যথা – মুখ্যঘুণ ও গৌণগুণ। এছাড়াও তৃতীয় পর্য়ায়ের একটি গুণের কথাও বলেন যাকে তৃতীয় স্তরের গুণ বলা হয়। এই তৃতীয় প্রকার গুণ বা Tertiary quality-র সরাসরি ইন্দ্রিয় সংবেদন আমাদের হয় না ঠিকই কিন্তু তা পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের কাছে অনুভূত হয়। আর এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে।

অর্থাৎ যখনই নিছক 'কিছু না' বা শূন্য থেকে কোন কিছু উৎপন্ন হয় তখন সেই নির্মাণকে সৃষ্টি বলে। যেমন অনেক ঈশ্বর বিশ্বাসী মনে কেরন যে, জগৎ গঠন করার সময় জগতের অন্তিম উপাদান যে পরমাণু তা ঈশ্বর 'কোনকিছু না' বা শূন্যতা থেকে উৎপন্ন করেছএন যার গুণ বা আধার অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আর এই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় শক্তিকে আমরা কখনই অভিজ্ঞতায় পাব না। আমরা সৃষ্টির এই ধারণাটি পাব ঐ তৃতীয় প্রকার জ্ঞানের মধ্য দিয়ে। যেহেতু সংবদেন ও অন্তর্বেদন কোনটিরই মধ্য দিয়ে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কোন ধারণার ব্যাখ্যায় সম্ভব নয়। যার মাধ্যমে জানা যাবে তা হল তিনপ্রকার কার্য উৎপাদন প্রক্রিয়া যথা – প্রজনন, পরিবর্তন সাধন অথবা নির্মাণ এবং সৃষ্টি।

বার্কলি (Berkeley): জন বার্কলে ১৬৮৫ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন আয়ারল্যাণ্ডে কিমকেন্নি নগরে এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৭৫৩ খ্রীঃ। লকের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদের পরিণতি হল বার্কলের আত্মগত ভাববাদ।

বার্কলে লকের সমালোচনা করে বলেন যে, জড় বা বস্তু যদি অজ্ঞাত হয় তাহলে তার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করা যায় না। তাঁর মতে, প্রত্যেকটি বস্তু যা আমরা দেখি বিভিন্ন গুণের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, বার্কলের মতে, বস্তুর সব গুণই মনের উপর নির্ভরশীল এবং এ হিসেবে লকের দেওয়া গৌণগুণের মতো মুখ্যগুণ ও মন নির্ভর। কাজেই সব বস্তুর সব গুণই একই ধরণের এবং গুণ এসবের ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়, এদিক থেকে যাকে আমরা সচরাচর জড় বলে মনে করি তা আসলে মনের কতকগুলো ধারণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বার্কলে এভাবেই জড়ের অস্তিত্বকে খণ্ডন করেন এবং সব বস্তুকে প্রত্যক্ষ নির্ভর বলে মনে করেন। তাঁর মতে, বস্তু বা জড় ব্যক্তি ও ঈশ্বরের মনের ধারণামাত্র। তাই মনের বাইরে জড়দ্রব্য বলে কিছু থাকতে পারে না অর্থাৎ জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব নেই।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় প্রত্যক্ষজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না, ইত্যাকার যে উপলব্ধির কথা বার্কলে বলেছেন সে উপলব্ধি সকলের নাও থাকতে পারে। বস্তুত বস্তুবাদী দার্শনিকেরাই বলেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় বস্তুভিমুখী। তবে বার্কলে যা বলতে চান তাহল – জড়বস্তুগুলির অস্তিত্ব চৈতন্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সে জ্ঞান এক বা একাধিক সসীম আত্মার জ্ঞান নয়। তাহল এক অনন্ত বিশ্বাত্মার জ্ঞান। আর এই অনন্ত বিশ্বাত্মার জ্ঞানের বিষয় হল একমাত্র জড়জগৎ। তিনি জড়জগৎ সম্পর্কে যা কিছু বলতে চেয়েছেন তা হল মূলত ব্যক্তিতান্ত্রিক।

বার্কলে তাঁর মতবাদের প্রথম পর্যায়ে বলেছিলেন বাহ্য জগতের অস্তিত্ব যদি ব্যক্তিমন বা ব্যক্তি চেতনার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অস্থায়ী হয়ে পড়ে। যেহেতু অন্য মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি না। তবে পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাঁর মত কিছুটা পরিবর্তন করেনি এবং তিনি এক দোষের স্বীকার হন যার না অহংসর্বস্ববাদ। এই দোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তিনি ঈশ্বর মন বা পরমাত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেন, ঐ পরমাত্মা বা ঈশ্বরই সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান অবস্থায় থেকে এই জড়জগৎ বা বাহ্যজগতের সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্ট জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিরন্তন চলতে থাকছে। সুতরাং ঐ বিশ্বাত্মার জ্ঞানের বিষয় হয়েই জগৎ অস্তিত্বশীল।

হিউম (David Hume): 'কলা' (Art) ও দর্শনের (Philosophy) প্রতি একান্ত অনুরাগী ডেভিড হিউম জন্মগ্রহণ করেন ১৭১১ খ্রীঃ এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৭৬১ খ্রীঃ। হিউম ব্যক্তির অভিন্নতার সমস্যা (The problem of personal identity) প্রসঙ্গে জগতের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, স্থিরবস্তু বলে বাস্তবিক কিছু নেই, এ প্রকার দ্রব্যের ধারণা এক ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। বাহ্যজগৎ হল আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবেদনগুচ্ছের জ্ঞান বা ধারণা।

এই জড়জগৎ এবং মনুষ্যেতর জগৎ কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই সম্পর্ক কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে গঠিত। এই সম্পর্ক অনুযায়ী কোনো আবশ্যিকতার সম্পর্ক নেই। যা আছে তা হল এক পৌর্বপর্ম সম্পর্ক বা প্রত্যাশার সম্পর্ক। এই প্রকৃতির একরূপতা নীতির উপর নির্ভর করেই সমগ্র জগৎ গঠিত হয়েছে। পরিবর্তনের কাজেই শত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।

বিশ্বতত্ত্ব বা সৃষ্টির আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা আলোচনা করতে গিয়ে আমার পাশ্চাত্য দর্শনের অপর একটি শাখার আলোচনা প্রসঙ্গ ক্রমে ক্রমে এসে পড়ছে। তা হল বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকবৃন্দের মতামতগুলি। আমি এখানে কেবলমাত্র তিনজন দার্শনিকের মতামত আলোচনা করেই প্রবন্ধের ইতি টানব। তা নিম্নরূপ :

জি.ই. ম্যুর (G.E. Moore): এই বিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণীর দার্শনিক জি.ই. ম্যুর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৩ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৯৫৮ খ্রীঃ। ম্যুর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন – জগৎ ও বিজ্ঞান আমাকে কোনো দার্শনিক সমস্যার মুখোমুখি করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি না। জগৎ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অন্যান্য দার্শনিকরা যা বলেন সেগুলিই

আমাকে দার্শনিক সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে কৌতুহলী করে তোলে। জগৎ সম্পর্কে যাবতীয় বাক্য, বস্তু, বিষয় সকলকে সত্য বলেই ধরে নিই েবং জড়বস্তু মাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে চৈতন্য ক্রিয়াসমূহ সেই ব্যাখ্যাও দিয়ে থাকেন।

ম্যুরের মতে, বাহ্যজগতের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে কি ? নব্য বস্তুবাদী দার্শনিক ম্যুর বলেছেন জড়বস্তুর যেমন অস্তিত্ব আছে তার পাশাপাশি চৈতন্য বা চেতন দ্রব্যেরও অস্তিত্ব আছে। তাই বহির্জগতের অস্তিত্বকে পূর্ব থেকেই সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং এই বিষয়ের বাক্যগুলির অর্থ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। তথাপি সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন।

রাসেল (Bertrand Russel): বিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাসেল। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭২ খ্রীঃ এবং পরলোক গমন করেন ১৯৭০ খ্রীঃ 'Denotation Theory of Meaning' গ্রন্থে জগতের ব্যাখ্যা খুবই সামান্য দিয়েছেন। তার সারসংক্ষেপ হল – প্রতিটি শব্দ বা পদ হল কোন কিছুর নাম। তবে সব শব্দই সব কিছুর নাম হতে পারে না, যেমন – সোনার 'পাথর বাটি', পক্ষীরাজ ঘোড়া ইত্যাদি। ঐ সকল নামে কোন ব্যক্তি, বস্তু, গুণ, ক্রিয়া কিছুই নেই। ঐ গুলি যদি নাম হয় তাহলে দেশকালের জগতের বাইরে থাকতে হবে। কিন্তু ঐ গুলি কোন জগতেই নেই। কাজেই জগৎকে বুঝতে হবে ভাষার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বর্ণনের মধ্য দিয়ে।

ভিটগেনস্টাইন (Wittgenstein): বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন ভিটগেনস্টাইন। তিনি Tractatus গ্রন্থে 'জগৎ', 'ব্যাপার', 'বিষয়' এবং 'ভাষা' সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জগৎ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত তিনটি বাক্য – 1) The world is all that is the case (2) The world is the totality of facts, not of things, 3) The world divides into facts অর্থাৎ জগৎ হল যাবতীয় ব্যাপারের সমষ্টি, বিষয়ের সমষ্টি নয়। জগৎ হল বিষয় নিয়ে গঠিত উপাদান। আসলে জগৎ হল সমগ্র সম্ভাব্য পরিস্থিতির একটি থলি এবং বাস্তব সত্তার থেকেও ব্যাপক।

এই ব্যাপার হল জগতের অস্তিত্বশীল বাস্তব যৌগ। জগৎ ব্যাপারেই বিভাজ্য এবং ক্ষুদ্র ব্যাপার কণাটি হল পারমাণবিক ব্যাপার (atomic fact) জগৎকে ক্রমবিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় ঐ অবিশ্লেষণযোগ্য পারমাণবিক ব্যাপার দ্বারাই জগতের আদি উপকরণ তৈরী হয় এবং জগৎ শেষপর্যন্ত এই atomic fact-এ বিশ্লেষিত হয়ে জাগতিক বস্তুর বর্ণনা দিতে পারে।

সিদ্ধান্ত : আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিশ্বতত্ত্বের পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং বিস্তারিত বিববরণের ব্যাখ্যাকরণের পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, একবিংশ শতকে এই 'বিশ্বতত্ত্ব' ও 'আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের' আলোচনা গভীর ভাবে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

কেননা আধুনিক সামাজিকীকরণের ফলে ব্যক্তি মানুষের মন থেকে এবং চিন্তাধারার মধ্যে এই পাশ্চাত্য দর্শনের বিশ্বতত্ত্বের প্রতি প্রচণ্ড অনিহা দেখা দিচ্ছে, যা একেবারেই সমীচীন হওয়া উচিত নয়। কারণ আমরা নিজেদের অস্তিত্বকে এবং তার পাশাপাশি আমরা যে জগতে বসবাস করছি তার পূর্বের ইতিহাসকে অস্বীকার করতে পারি না। যেহেতু শিকড় থেকে তার গাছকে উপরে ফেললে যেমন গাছের বৃদ্ধি হয় না তেমনি জগৎ সৃষ্টির তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করলে নিজেকে অগ্রাহ্য করা হয়। সর্বোপরি এই সবের মূলে যে প্রকৃত কারণ রয়েছেন যিনি হলেন ঈশ্বর। সর্বশক্তিমান তাকেই অস্বীকার করা হয়। তাই এই একবিংশ শতকে খুবই প্রাসঙ্গিক ও সমাজসংস্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র -

১। সমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পাশ্চাত্য দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪

২। স্বপ্না সরকার, পাশ্চাত্য দর্শনের সমীক্ষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন, নতুন সংস্করণ ২০২২

৩। কল্যানচন্দ্র গুপ্ত ও বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রগ্রেসি পাবলিকেশন, ২০১৯

৪ মহুয়া ঘোষ, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা, প্রগ্রেসি পাবলিকেশন, ২০১৯

৫। অভীক কুমার ব্যানার্জি, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ভলিউম ২, সাঁতরা পাবলিকেশন, ২০১৯

৬। গৌতম মুখার্জী, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, বুক সিন্ডিকেট, ২০২২

৭ ডক্টর চন্দ্র শর্মা, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, মহাবীর পাবলিকেশন, আসাম, ২০২০

৮. নিরোধবরণ চক্রবর্তী, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,২০১৯

৯. চন্দ্রদ্বয় ভট্টাচার্য, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৯